গ্যাস দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ আদায়

ভারত পেরেছে বাংলাদেশ কেন পারেনি

আরিফ খান মিরণ

শুরুতেই পাঠককে একটা গল্প বলি। গল্প হলেও এ গল্পের বিশেষত্ব হলো এটি 'কাহিনী' বা 'ফিকশন' নয়- বরং 'সত্য ঘটনা'।

ভারতের একটি রাজ্য মধ্যপ্রদেশ। এই রাজ্যের একটি শহর ভোপাল। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ২/৩ তারিখে শীতের গভীর রাত। শহরের সব লোকই গভীর ঘুমে অচেতন। তারা কেউই হয়তো কল্পনা করেও ঘুমায়নি যে, তাদের অনেকেরই এ রাতের ঘুমই শেষ ঘুম- তারা আর কোনো দিন জাগবে না। তাদের শহরেই ছিল ইউনিয়ন কার্বাইড (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের একটি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি। এটি একটি আমেরিকান কোম্পানি। মধ্যরাতের দিকেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা যেটি ঘটবে সেটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মধ্যরাতের দিকে ভয়ঙ্করতম গ্যাস মিথিল আইসোসিয়ানেট (এমআইসি) লিক হতে লাগল। গ্যাস মেঘের মতো একটি একটি আবরণ সারা শহরকে এর লিথাল চাদরে ঢেকে ফেলল এবং যা ঘটার তা ঘটে গেল। পাহাড় ও হ্রদে ঘেরা পুরো শহরটি যেন পরিণত হলো একটি গ্যাস চেম্বারে। ভোপালবাসী বিশ্বের অন্যতম ভয়ানক নৃশংসতম একটি ঘটনা দেখছিল।

তারপর : ৩ ডিসেম্বর সকালে পুরো বিশ্ববাসী অবিশ্বাস্য-হতভম্বতায় জানল এই ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা। তাৎক্ষণিকভাবে ৩ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল (সব মিলিয়ে মারা গেছে ৩ হাজার ৮০০ জন)। হাজার হাজার মানুষ শারীরিকভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করল। গৃহপালিত জন্তু মারা গেল, কিছু আহত হলো এবং সংক্রামক রোগ ছড়াতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। পরিবেশ দূষিত হলো প্রচণ্ডভাবে। মোট কথা, সারা শহরটিই বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে গেল।

সরকার যা করল : দুর্ঘটনার ভয়াবহতা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এ অবস্থা মোকাবেলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। দুর্ঘটনার পরপরই এডহক ভিত্তিকে একটি কমিটি গঠন করা হলো। রিলিফ বিতরণ ও জনমনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য কমিটি কাজ করতে লাগল। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে ১৯৮৫ সালের শুরুতেই 'ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা রিলিফ ও পুনর্বাসন বিভাগ' নামে একটি বিভাগ গঠন করা হলো। শহরের ৩৬টি ওয়ার্ড বিষাক্ত এমআইসি গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছিল। ৩৬টি ওয়ার্ডের প্রায় ৬ লাখ লোককে ওই বিভাগের অধীনে এনে রিলিফ ও পুনর্বাসন করা হচ্ছিল। একটি মেডিকেল ডিস্ট্রিক্ট গঠন করে আক্রান্তদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়। রিলিফ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য অর্থনৈতিক কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও দায়ী কোম্পানি (ইউনিয়ন কার্বাইড লিমিটেড) সবাই টাকা নিয়ে প্রস্তুত ছিল।

দুর্ঘটনার কারণ : দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানি দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। কনসালটিং ফার্ম আর্থার ডি. লিটলকে দায়িত্ব দেয়া হয় কারণ খুঁজে বের করার জন্য। দুর্ঘটনার কারণ ছিল গ্যাস টেঙ্কে কেউ ইচ্ছে করে পানি ফেলে দিয়েছিল। এর ফলেই এতো বড় অঘটন। প্রায় ৪ হাজার মানুষের মৃত্যু, হাজার হাজার মানুষের পঙ্গুত্ব ও রোগবালাইয়ের শিকার।

দুর্ঘটনা, প্রতিক্রিয়া এবং মীমাংসা : ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানি শুরু থেকেই আক্রান্তদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

দুর্ঘটনার পর ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিল তা দেখা যাক :

* দুর্ঘটনার পরপরই প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডে ২ মিলিয়ন ডলার সাহায্য হিসেবে প্রদান করা হয়।

* শুরু থেকে সব সময়ই তারা ওষুধ ও স্বাস্থ্য সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করেছে।

* আক্রান্তদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মেডিকেল টিম পাঠানো হয়।

* ভারতীয় মেডিকেল এক্সপার্টদের দিয়েও একটি টিম গঠন করা হয়।

* ভোপালে একটি ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য আরিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়কে ২.২ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়।

* ৫ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয় ইন্ডিয়ান রেডক্রসকে।

* ভোপাল হাসপাতালের জন্য একটি স্বাধীন দাতব্য ট্রাস্ট গঠন করা হয় এবং প্রাথমিক তহবিলে ২০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়।

* পরবর্তীতে কোর্টের আদেশ অনুসারে হাসপাতালের দাতব্য ফান্ডে আরো ৯০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়।

মীমাংসা : দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নাকি ভারতের আদালতে মামলা হবে এ নিয়ে টানাপড়েনের পর সিদ্ধান্ত হয় ঘটনাস্থল যেহেতু ভারত সুতরাং ভারতের আদালতেই মামলা চালু হোক। ১৯৮৯ সালের মে মাসে

ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড ভারত সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৭০ মিলিয়ন ডলার দেবে বলে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর মাত্র ১০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের ৪৭০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে দেয় এ কোম্পানি। ক্ষতিপূরণের টাকার হিসাবে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল ভারতীয় আইনের অধীনে সাধারণত যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় বা অতীতে হয়েছিল সেই তুলনায় এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। ১৯৯০ সালের নবেম্বরে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করে যে ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়ার জন্য যে পরিমাণ টাকা লাগবে বলে ধরা হয়েছিল তারচেয়ে দ্বিগুণ টাকা ব্যাংকে আছে।

মীমাংসার ১৫ বছর পর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে আদেশ করে যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পরও যে টাকা ব্যাংকে রয়ে গেছে তা ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বন্টন করে দিতে। এবং প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে সবাইকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পরও যে টাকা ব্যাংকে জমা ছিল শুধু তারই ইন্টারেস্ট জমা হয়েছিল প্রায় ৩২৭ মিলিয়ন ডলার।

পাঠক, এ পর্যায়ে আপনাদের জন্য আরেকটা গল্প রয়েছে। এটিও সত্য ঘটনা। তবে এ গল্পের প্লট আর ভারত নয়- এবার বাংলাদেশ।

যেখানে সবুজ থাকার কথা ছিল...

নাইকো

ছাতক গ্যাসক্ষেত্র ১৯৫৯ সালে আবিস্কৃত হয়। এই কূপটি ছাতক-১ হিসেবে পরিচিত। এই গ্যাসক্ষেত্রটি থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের পর কূপে অত্যাধিক পানি আসার কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই গ্যাসক্ষেত্রটিতে মোট মজুদ প্রায় ৩৩২ বিলিয়ন ঘনফুট, যার অধিকাংশই উৎপাদন করা হয়নি। এই ক্ষেত্রটি থেকে গ্যাস উৎপাদন পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে বাপেক্সকে পাশ কাটিয়ে সরকার কানাডিয়ান বহুজাতিক নাইকো রিসোর্স কোম্পানিকে ইজারা দেয়। এই কোম্পানি ছাতক- ১ এর কাছেই ছাতক-২ কূপটি খনন করা শুরু করে এ বছরের প্রথম দিন থেকে। সেই মোতাবেক তারা কাজও শুরু করে। কিন্তু কূপ খননকারী কানাডাভিত্তিক নাইকো কোম্পানির চরম অবহেলা ও অপেশাদারিত্বের জন্য ঐ গ্যাসক্ষেত্রে দু'দুবার বিস্ফোরণ ঘটে। ছাতক -২ (টেংরাটিলা) কূপটিতে ব্লো-আউট অবশ্যম্ভাবী ছিলনা। এর যথার্থ কারণ সরকার গঠিত তদন্ত কমিটি খুঁজে বের করেছে। কূপ-নকশা এবং খননকর্মে ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। উপরোক্ত ত্রুটিটি ছিল ১৯৯৭ সালে মৌলভীবাজারের মাগুরছড়া কূপে সংঘটিত দুর্ঘটনার মতো। মাগুরছড়ায় দুর্ঘটনার পর তার কারণ তদন্ত করে দেখা যায় যে, কূপ খননকারী অক্সিডেন্টাল কোম্পানির কূপ-নকশা এবং খনন পদ্ধতিতে ত্রুটি এবং এর সঙ্গে কোম্পানির অবহেলা ও দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করা হয়। একইভাবে টেংরাটিলা কূপেও কূপ-নকশা ও খনন কাজের একই ধরনের ত্রুটি হয়েছে। কূপটিতে যথাযথভাবে কেসিং না করার ফলে গ্যাস নরম বালি স্তরে চারদিকে ঢুকে পড়ে ও তা কূপের পরিপার্শ্বে ও বহু স্থান দিয়ে বের হতে থাকে। আর গ্যাসস্তর থেকে পুলিং আউট করার ফলে গ্যাস উপরে উঠে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভূ পৃষ্ঠে এসে দুর্ঘটনাটি ঘটায়।

গত ৭ জানুয়ারি ও ২৩ জুন টেংরাটিলায় অবস্থিত ছাতক গ্যাসক্ষেত্রে দু'দফা বিস্ফোরণের কারণে নাইকোর অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও চুক্তির বিষয়টি আলোচনায় আসে। এ গ্যাসক্ষেত্রে দু'দফা বিস্ফোরণে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকার গ্যাস সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ সমৃদ্ধ গ্যাসক্ষেত্রটির ভবিষ্যৎ এ কারণেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

'কারণ অনুসন্ধানও দায়ী নির্ধারণে' সরকার গঠিত ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল দুর্ঘটনার পর। ড. এম তামিম (BUET) ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক। তদন্তের ফলাফলে বলা হয়, দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ডের জন্য কানাডীয় জ্বালানি কোম্পানি নাইকো দায়ী।

প্রথম দফায় গ্যাসের ক্ষতি নির্ধারণে গঠিত কমিটি দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে ৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে ৫২ বিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাসের কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছিল বলে প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছিল।

অবহেলা

বর্তমানে ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের টেংরাটিলায় দ্বিতীয় যে বিস্ফোরণটি ঘটানো হল, এর পরিণতি যে ভয়াবহ তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৭ই জানুয়ারী তারিখে টেংরাটিলা কূপে ত্রুটিপূর্ণ নকশা এবং ভূল ড্রিলিং করার কারণে নাইকো যে বিস্ফোরণটি ঘটায়, তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানের দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে। প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় গ্যাস স্তরটিতে, যা কিনা ভূপৃষ্ঠের ৫৫০ মিটার গভীরে অবস্থান করে এবং যেখান থেকে গ্যাস অনিয়ন্ত্রিতভাবে বের হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ঐ গ্যাস স্তরটির ওপরে অবস্থিত বড় পুরুত্বের একটি বালুস্তরের (তিপামস্যান্ড) ভেতরেও গ্যাস অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঢোকে ও ছড়িয়ে পড়ে। আর বর্তমান বিস্ফোরণটি এর সঙ্গেই সম্পর্কিত। অর্থাৎ ঐ সময়ে ওপরের তিপামস্যান্ড- বালুস্তরে যে গ্যাস ঢুকে ছড়িয়ে পড়ে তা নানাস্থানে জমা হয়ে উচ্চচাপ নিয়ে বসে থাকে। আর এবার এই রিলিফ কূপটি প্রথম কূপটির পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কোনাকুনিভাবে খনন করার সময় এরকম গ্যাস তীব্রভাবে ওপরে এসে ধাক্কা দিলে নাইকো এবারও তা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় এবং বিস্ফোরণ কবলিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নাইকোর কুপ খনন বিশেষজ্ঞরা চরম অপেশাদারিত্ব ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছে।

ক্ষতির পরিমাণ

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো টেংরাটিলার গ্যাসক্ষেত্রটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হবে ? উল্লেখ্য যে, নাইকো কোম্পানি জানুয়ারি মাসে বিস্ফোরণ ঘটায় ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় গ্যাসস্তরটিতে। এই গ্যাসস্তরটির প্রায় ৫৫০মিটার গভীরতায় অবস্থান করে এবং এটিতে ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট (বিসিএফ) রয়েছে বলে বাপেক্স ও নাইকো ইতিপূর্বে নির্ধারণ করে। যার বাজার মূল্য প্রায় ১ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা। প্রথম বিস্ফোরণে টেংরাটিলা কূপ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে গ্যাসের বড় অংশ বের হয়ে নষ্ট হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিস্ফোরণে আরো গ্যাস নষ্ট হয় এবং প্রায় দুইমাস ধরে নষ্ট হতে

দুর্ঘটনার পরপরই জনগণকে যে পরিমাণ সাহায্য প্রদান করা হয়

ডিসেম্বর ১৯৮৪তে প্রদত্ত অর্থনৈতিক সাহায্য	১৮০ কোটি রুপি
৭৮ হাজার ৮০০ পরিবার যাদের মাসিক রোজগার ৫০০ রুপির কম তাদেরকে প্রদত্ত রিলিফ	১১.৮০ কোটি রুপি
আক্রান্তদের বিনামূল্যে খাদ্য ও দুধ সরবরাহ	১৯.২০ কোটি রুপি
২২৪৬টি প্রাণীর মৃত্যুর জন্য নৈতিক কারণে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	০.২৫ কোটি রুপি
নিহতদের পরিবারকে প্রদত্ত অর্থ (৩৩৮৭ জন নিহতের জন্য মাথাপিছু ১০ হাজার রুপি)	৩.৭৮ কোটি রুপি
মোট	৩৬.০৩ কোটি রুপি

থাকবে। মোট যে পরিমাণ গ্যাস নষ্ট হচ্ছে তার পরিমাণ ১১৫ বিলিয়ন ঘনফুট বা তার চেয়ে বেশী হতে পারে। অর্থাৎ যদি কেবল একটি স্তর নষ্ট হয় তবে তার মজুদ হল মোট ক্ষতি। কিন্তু দু'দুটো বড় বিস্ফোরণে যদি গ্যাসক্ষেত্রের ভেতর কাঠামোগত ক্ষতি এতটা হয়ে থাকে যে ঐ ক্ষেত্রে গ্যাস উত্তোলন সম্ভবই নয়, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ মোট গ্যাস মজুদ প্রায় ২৬০ বিসিএফ। যার বাজার মুল্য ৪ হাজার ৪২০ কোটি টাকা। কীভাবে পুনরুদ্ধার করা হবে এই বিশাল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ক্ষতিকে।

চুক্তি

কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে বাপেক্সের জয়েন্টভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট বা যে চুক্তি করা হয়েছে তাতে কার্যবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারা রয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী নাইকো হলো 'অপারেটর' আর বাপেক্স হলো পার্টনার। আর চুক্তিপত্রে স্পষ্টত বলা হয়েছে, গ্যাস ক্ষেত্রে 'অপারেটর' পেশাদার দক্ষ ও স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে পেট্রোলিয়াম অপারেশন করতে বাধ্য থাকবে। অপারেটর বাপেক্সকে রেগুলার তার কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত করবে।

উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী ড্রিলিং কাজটি মূলত অপারেটর অর্থাৎ নাইকো করবে এবং এর দায় দায়িত্ব পুরোপুরি মাত্রায় তার নিজের। তদারকি কাজ করার জন্য বাপেক্স এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে বটে, কিন্তু দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রধান পার্টি হলো নাইকো। বিস্ফোরণের পরপরই বাপেক্সের ২ জন কর্মীকে মন্ত্রণালয়ের আদেশে সাসপেন্ড করা হয়েছে যা নেহাতই দুঃখজনক।

গ্যাস ও তেল উত্তোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির নাইকোর সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তি ভয়াবহভাবে অসম,অযৌক্তিক, লুণ্ঠনভিত্তিক, জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও দেশের জন্য ক্ষতিকর।

নাইকো ও বাপেক্সের যৌথ অংশীদারী চুক্তির ১৬ ধারায় বলা আছে নাইকো যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ওই ধারায় আবার এও বলা আছে যে চুক্তি বাতিল হলেও রিলিফ কূপ নাইকোকেই খনন করে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন বলেন, সংবিধানের ১৪৩ ও ১৪৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ চুক্তি করে সংবিধান ও আইনকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, চুক্তিটিতে অনেক অস্বচ্ছতা আছে। যদিও সংবিধান অনুসারে জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তিতে অস্বচ্ছতা থাকার কথা নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এ চুক্তি করার মাধ্যমে নাইকো এবং এর সহযোগীদের বেআইনিভাবে লাভবান করা হয়েছে।

প্রতারণা

ছাতক গ্যাসক্ষেত্রকে পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল দেখিয়ে যে জয়েন্টভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। প্রথমত, ছাতক গ্যাসক্ষেত্র কখনো পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল ঘোষণা করা হয়নি। যে গ্যাসক্ষেত্রটিতে মোট ৪টি স্তরে ২৬০ বিসিএফ গ্যাস ছিল, তা পেট্রোলিয়াম ব্যবসার কোন সংজ্ঞায় পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল হতে পারে না। এর চেয়ে অনেক কম গ্যাস মজুদ নিয়েও বাংলাদেশেই একাধিক গ্যাসক্ষেত্র উৎপাদন পর্যায়ে রয়েছে। যেমন- ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র (মজুদ ২৫০ বিসিএফ), মেঘনা গ্যাসক্ষেত্র (মজুদ ৭১ বিসিএফ), নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র (মজুদ ২৫ বিসিএফ) ইত্যাদি। তাছাড়া অন্য কোম্পানির সঙ্গে যোগ্যতায় পূর্ববর্তী সময়ে নাইকো প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব থাকায় পিএসসি চুক্তি করতে

গ্যাসের চাপে পাম্প ছাড়াই পানি বেরিয়ে আসছে

পারেনি। কিন্তু তবুও এই কোম্পানিটিকে এককভাবে ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের মতো এ রকম সম্ভাবনাময় একটি গ্যাসক্ষেত্র কেন দেওয়া হল? সম্ভাবনাময় গ্যাসক্ষেত্র পরিত্যক্ত দেখিয়ে নতুন চুক্তি করা নাইকোর সুস্পষ্ট প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

বাংলাদেশ কী পারত না

তেল-গ্যাস উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রয়েছে বাপেক্স। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সাফল্য দেখিয়েছে। বিদেশী কোম্পানির কাছে তেল-গ্যাসক্ষেত্র ইজারা দেয়ায় বাপেক্সের ৩০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ছে, ১৩০০ দক্ষ কর্মকর্তা বেকার হচ্ছে ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হচ্ছে। বিদেশী কোম্পানিকে ইজারা দেয়ায় গ্যাস আবিষ্কারের খরচ দিতে হচ্ছে আমাদের। অথচ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান-উত্তোলনে বাপেক্সের খরচ বিদেশী কোম্পানির চেয়ে অনেক অনেক কম। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সকল গ্যাসক্ষেত্র দেশীয় কোম্পানি বাপেক্সকে দিয়েই কূপ খনন-উত্তোলন-বিপণন করা যেত। এজন্য বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিকে শেয়ার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর্থিক অনটনের প্রশ্ন অবান্তর। হাজার হাজার কোটি টাকার গ্যাস উত্তোলনের জন্য মাত্র ৪০ কোটি টাকা দিয়ে কূপ খনন করা যায়। দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবছর মাত্র ৪ টি কূপ খননের জন্য ১৬০ কোটি টাকা করা দরকার হয়। এছাড়া প্রতিবছর পেট্রোবাংলা ২,০০০ কোটি টাকার উপরে সরকারকে প্রদান করে, এর শতকরা ১০ ভাগ অর্থাৎ ২০০ কোটি টাকা অন্তত গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নে ব্যয় করা হলে তেল-গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন খাতে বিদেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় না। কারিগরি দক্ষতার প্রশ্নও অবান্তর। ইতিমধ্যে বাপেক্স ফেঞ্চুগঞ্জ, সালদা নদী ইত্যাদি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে উৎপাদন চালু রেখেছে। তাহলে মাগুরছড়া, ছাতক-টেংরাটিলাসহ সকল গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খনন করতে বাপেক্সের পক্ষে কোনো অসুবিধা ছিল না। সরকার যদি ইউনোকল কোম্পানির স্বার্থে মুনাফা যোগান দিতে গিয়ে ২টি কূপের গ্যাস ক্রয় বাবদ ২২৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা অথবা ৪টি কূপের গ্যাস ক্রয় বাবদ ৪৫২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বছরে ভর্তুকি দিতে পারে। তাহলে প্রতিবছর পেট্রোবাংলা যে উদ্বৃত্ত ফান্ড সরকারকে প্রদান করে, এর শতকরা ১০ ভাগ তেল-গ্যাস উত্তোলনকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের মাধ্যমে গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয় কেন? ইউনোকলের কাছ থেকে ২টি কূপের গ্যাস ক্রয় বাবদ ২২৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকার ভর্তুকী দিয়ে বাপেক্স ৫টি অথবা ৪টি কূপের গ্যাস ক্রয় বাবদ ৪৫২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার ভর্তুকী দিয়ে ১১টি গ্যাসকূপ প্রতি বছরে উত্তোলন করতে পারতো। তবে কেন নাইকো বা ইউনিকল? বাংলাদেশ কি পারত না?

যশ্মীন দেশে যদাচার

ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। নাইকো রিসোর্সেস বাংলাদেশ লিমিটেড কানাডা ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। প্রথমোক্ত কোম্পানির কর্মস্থল ভারতের মধ্য প্রদেশ আর দ্বিতীয়োক্ত কোম্পানির কর্মস্থল বাংলাদেশের সিলেট। দুটি কোম্পানিই তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অবহেলার কারণে সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, মারা গেছে মানুষ, পঙ্গুত্ববরণ করেছে অনেকে। বেশুমার ক্ষতি সাধিত হয়েছে প্রাণের, প্রাণীর, পরিবেশ ও প্রতিবেশের। এ পর্যন্ত তো ঠিকই আছে। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার পর ইউনিয়ন কার্বাইড লিমিটেড যা করল বা করতে বাধ্য হল বাংলাদেশের 'নাইকো' কেন তা করল না? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

মহামান্য হাইকোর্ট নাইকোর সব ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপিল আবেদনে সেই নির্দেশ বাতিল করা হয়। তবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে নাইকো কোনোভাবেই দেশের বাইরে কোনো টাকা পাঠাতে পারবে না। এটাও কম নয়।

তবুও ক্ষতিপূরণ আদায় হোক। অবহেলা ও অপেশাদারিত্বের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা হোক। নইলে নিকট অতীতের মতো ভবিষ্যতেও এই দুর্বল বাংলাদেশের প্রাণ, প্রাণী ও সম্পদ অরক্ষিতই থেকে যাবে।